প্রথম অধ্যায় । ভূমিকা

বাংলা ভাষায় কামরূপী উপভাষার গুরুত্ব ॥

বাংলা ভাষায় যে কটি উপভাষা (DIALECT) রয়েছে তার মধ্যে কামরূপী উপভাষার গুরুত্ব যে কটি কারণে অপরিসীম (তার মধ্যে) সেগুলোর মধ্যে প্রধানতম কারণ হচ্ছে এর জন গোষ্ঠী । যে বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী এই ভাষায় কথা বলেন তাদের ভৌগলিক পরিসর এত বৃহৎ যে সেই অঞ্চলের আয়তন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনকেও ছাড়িয়ে যায় । অর্থাৎ ফারাক্কা পেরিয়ে যে পশ্চিমবঙ্গ মোট ১১টি জেলা নিয়ে গঠিত তার আয়তনকেও । আর সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে গেলে এই ভাষা-ভাষীর জনসংখ্যা এক কোটিকে যে অতিক্রম করবে সে কথা বলাই বাহুল্য । কেননা বর্তমানে খণ্ডিতবাংলার যে ভারতীয় ভূ-ভাগটিতে উত্তরবঙ্গ বলা হয় সেই ভূ-ভাগের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ বাহাত্তর লক্ষ । এবং এই জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলটিকেই কামরূপী উপভাষা-ভাষীদের ভারতীয় এলাকায় বৃহত্তম জনবসতির অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে । এছাড়া বিহারের পূর্ণিয়া জেলা নেপালের মোরঙ-ভদ্রপুর অঞ্চল ও মুখ্যত: এই উপভাষা-ভাষীদের অঞ্চল বলেই বলা চলে । যদিও এই সমস্ত অঞ্চলে স্থানীয় সরকারী ভাষাভাষীদের প্রভাবে কামরূপী উপভাষা অস্তিত্বের লড়াইয়ে ক্রমেই পিছু হটছে । এর পরই ভারতীয় এলাকার আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার কথা বলা চলে । এই জেলার মোট লোকসংখ্যা পঁচিশ লক্ষ । এই জেলার তিনটি মহকুমা । তার মধ্যে কোকরাঝার ও গোয়ালপাড়া দুটি মহকুমা এবং ধুবড়ী হচ্ছে সদর মহকুমা । এই ধুবড়ী মহকুমাতেই বর্তমান কামরূপী উপভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে । যে কামরূপী উপভাষার সাথে উত্তরবঙ্গের কামরূপী উপভাষায় কোনোরকমের পার্থক্য নেই । কোক্রাঝার এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারের গোয়ালপাড়া মহকুমায় প্রচলিত কামরূপী উপভাষার সাথে কামরূপ জেলার পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত বরপেটা মহকুমায় কামরূপী উপভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । এই অঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শ্রেণীর মানুষেই হাটে-বাজারে অফিস-আদালতে সর্বত্র দ্বিধাহীনভাবে এই উপভাষায় কথা বলেন । এদের মধ্যে যারা এককালে জমিদার পরিবারের প্রভাবশালী শাসক গোষ্ঠীর

মানুষ ছিলেন মুখ্যতঃ তাদের দ্বিধাহীন ও নিঃসংকোচে এই ভাষায় কথাবার্তা বলার জন্য সাধারণ শ্রেণীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও তার কোনোপ্রকার সংকোচবোধ ও পরিলক্ষিত করা যায় না এই ভাষায় পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে । এই প্রসঙ্গে ভূপেন হাজারিকা পরিচালিত ও স্বর্গীয় প্রমথেশ বড়ুয়ার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত জনকেশ বড়ুয়ার সহযোগিতায় 'মাহুত বন্ধুরে' সিনেমা চিত্রটিরও উল্লেখ করা যেতে পারে । চিত্রটি এই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজ থেকে দুই দশক পূর্বে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনায় সৃষ্টি করেছিল কারণ এর বিষয়বস্তু ও সঙ্গীতপ্রবাহ এই অঞ্চলের জনমানসেরই প্রতিচ্ছবি ছিল । এছাড়া বর্তমান মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড় জেলার ফুলবাড়ী, টিকরিকিলা প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যেও এক বিশাল মানবগোষ্ঠীই এই উপ-ভাষায় দৈনন্দিন কথা বার্তা বলেন ।

এর পরই আমরা উল্লেখ করতে পারি বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির কথা । যার মধ্যে রংপুর জেলার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । কারণ এই অঞ্চলের মধ্যেও এই কামরূপী উপভাষায় রচিত সেই বিখ্যাত (BALLAD) লোকগাথা গোপীচন্দ্রের গান এর সংগ্রহ করেন স্যার গ্রীয়ারসন সাহেব । এই গোপী-চন্দ্রের গান সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য করেছেন, "গোপীচন্দ্রের গান এপিক ধর্মী রচনা ইহার বিস্তার, ভাব গভীরতা এবং সমুচ্চ আদর্শ ইহাকে মহাকাব্যের গুণে মণ্ডিত করিয়াছে ।"[১] যে বইটি বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লোকসাহিত্য এর ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য বই বলে গ্রহণ করা হয়েছে । এছাড়াও এই জেলার গুরুত্ব এই ভাষাভাষীদের কাছে আরও একটি প্রধান কারণের জন্য বিখ্যাত । সেটি হচ্ছে ভাষাবিদ জর্জ গ্রীয়ারসন যখন ঢাকা অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে এই জেলায় অনুপ্রবেশ করেন তখন তিনি যে ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের সম্মুখীন হন তাতে তিনিই প্রথম চিহ্নিত করেছেন এই কামরূপী উপভাষার বদলে তার একটি নাম রাজবংশী উপভাষা, যেহেতু রাজবংশী বলে পরিচয় দেওয়া মানবগোষ্ঠীর ব্যাপক ও বৃহত্তম আবাস ভূমি এই রংপুর অঞ্চলেই তিনি তাদের দেখেছেন ।[২] এই রংপুর জেলা ব্যতিরেকেও আরও যেকটি জেলা এই অঞ্চলে কামরূপী উপভাষা-ভাষী গোষ্ঠী মানুষের আবাসস্থল সেগুলি হোল পূর্বদিনাজপুর এবং ময়মনসিংহের জামালপুর মহকুমা অঞ্চল ।

কামরূপী উপভাষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা আরও যে দুটি কারণের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে তার প্রথমটি হোল বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসের সর্বপ্রথম যা পাওয়া গেছে এই উপভাষার লক্ষণযুক্ত বাক্যরীতি, শব্দপ্রয়োগ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারযুক্ত কোচবিহারের (তদানীন্তন কামতাপুর) মহারাজ নরনারায়ণ এর লেখা চিঠিখানি যা ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে আহোমরাজ চুকামফাকে লেখা হয়েছিল । এই চিঠির প্রসঙ্গ 'কামরূপী উপভাষার গদ্যরীতি বিচার' পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ এর লেখা কামরূপী উপভাষা মিশ্রিত সাধু গদ্যে উপকথার সংকলন গ্রন্থের কথা স্মরণ করা যেতে পারে ।[৩] প্রকৃতপক্ষে বাংলা লোকসাহিত্যের বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে ব্যাপক অনুশীলন, প্রচার ও প্রসার পরিলক্ষিত হয় তার সূচনাপর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের (১৭৭৩- ১৮৩১) প্রচেষ্টাতেই যে হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে ।

বর্তমান গবেষণা কর্মের যৌক্তিকতা ॥

আমি ভূমিকা অংশের প্রথম পর্বেই দেখাতে চেষ্টা করেছি বাংলা ভাষায় কামরূপী উপভাষার গুরুত্ব কতখানি । এই পর্যায়ে আমি দেখাতে চেষ্টা করব বর্তমান গবেষণা কর্মের পেছনে যৌক্তিকতা কতখানি রয়েছে । ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মকাল । তার পূর্বে উত্তরবঙ্গবাসী ছাত্র সমাজকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্ধ সহস্র মাইল দূরবর্তী (কোচবিহার সহর থেকে) স্থানে অবস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হোত । আর পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের বৃহত্তম ও নানা সমস্যায় জর্জরিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষায় পশ্চাৎপদ কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গবাসীগণের সাংস্কৃতিক জীবনের আশা আকাঙ্খার প্রতি সম্যক দৃষ্টিপাত করা একপ্রকার অসম্ভবই ছিল । বস্তুতঃপক্ষে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ইংরেজ আমলে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি (প্রকাশনার ক্ষেত্রে -) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত গোপীচন্দ্রের গান-এর সুযোগ্য সম্পাদনা ।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকে দেশবিভাগজনিত পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের কামরূপী উপভাষা ভাষী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগ রংপুর, পূর্ব দিনাজপুর ও জামালপুর (ময়মনসিংহ জেলার) মহকুমা অঞ্চল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে ও এক গভীর সংকটের সৃষ্টি হয়। উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনও কুটীল রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই খণ্ডিত উত্তরবঙ্গের ভারতীয় ভূভাগের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির অনুশীলন, গবেষণা ও চর্চার ক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। ষাটের দশকে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ব্যাপক অনুশীলনের পথ স্বভাবতই সুগম হয়ে ওঠে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য ব্যতীরেকে একক প্রচেষ্টায় যে গুরুত্বপূর্ণ লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির কাজ উত্তরবঙ্গে হয়েছে তাহোল ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের "THE RAJBANSIS OF NORTH BENGAL" গবেষণা গ্রন্থখানি। এবং তারও যেসমস্ত কাজ এ প্রসঙ্গে হয়েছে তার সবগুলিরই গবেষণা কাজের ভৌগোলিক পরিসর বর্তমান ভারতীয় উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যেই আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ।

আমার প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মের পরিধি উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা ছাড়াও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ও এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোকজীবনের ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যেরঅনুসন্ধানে ব্যাপৃত। নিঃসন্দেহে বর্তমান গবেষণা কর্মের যৌক্তিকতার পক্ষে এটি একটি প্রধানতম কারণ বলা যেতে পারে।

কামরূপী উপভাষার সংজ্ঞা বিচার

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচিত O.D.B.L গবেষণা গ্রন্থে লিখেছেন THE BENGALI DIALECTS CANNOT BE REFERRED TO A SINGLE PRIMITIVE BENGAL SPEECH, BUT THEY ARE DERIVED FROM VARIOUS LOCAL FORMS OF LATE MĀGADHI APABHRANŚA, WHICH DEVELOPED SOME COMMON CHARACTERISTICS THAT MAY BE CALLED PAN-BENGALI.[8]

অর্থাৎ বাংলার উপভাষাগুলি নির্দিষ্ট কোন আদি বাংলাভাষা থেকে সৃষ্ট হয় সেগুলির উৎপত্তি হয়েছে মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের নানান্তর থেকে, যেগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পড়ে উঠেছে যাকে বলা যেতে পারে PAN-BENGALI বা PAN-BENGALI —র পরিভাষা হিসাবে 'অখণ্ড বাংলা ভাষা' বুঝানো যেতে পারে। কামরূপী উপভাষা সহ বাংলা ভাষার আর তিনটি উপভাষা যথা রাঢ় উপভাষা বরেন্দ্র উপভাষা ও বঙ্গ উপভাষা ও রয়েছে। এই চারটি বাংলার উপভাষা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে PAN-BENGALI.

ডঃ সুনীতি কুমার তাঁর বিখ্যাত O.D.B.L গ্রন্থে কামরূপী উপভাষাকে যেভাবে ভাষাতত্ত্বের বিচারে চিহ্নিত করেছেন তার পূর্ণ ছকটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হোল : —

Forms of Magadhi Prakrit and Apabhransa as brought to Bengal, Assam and Orissa

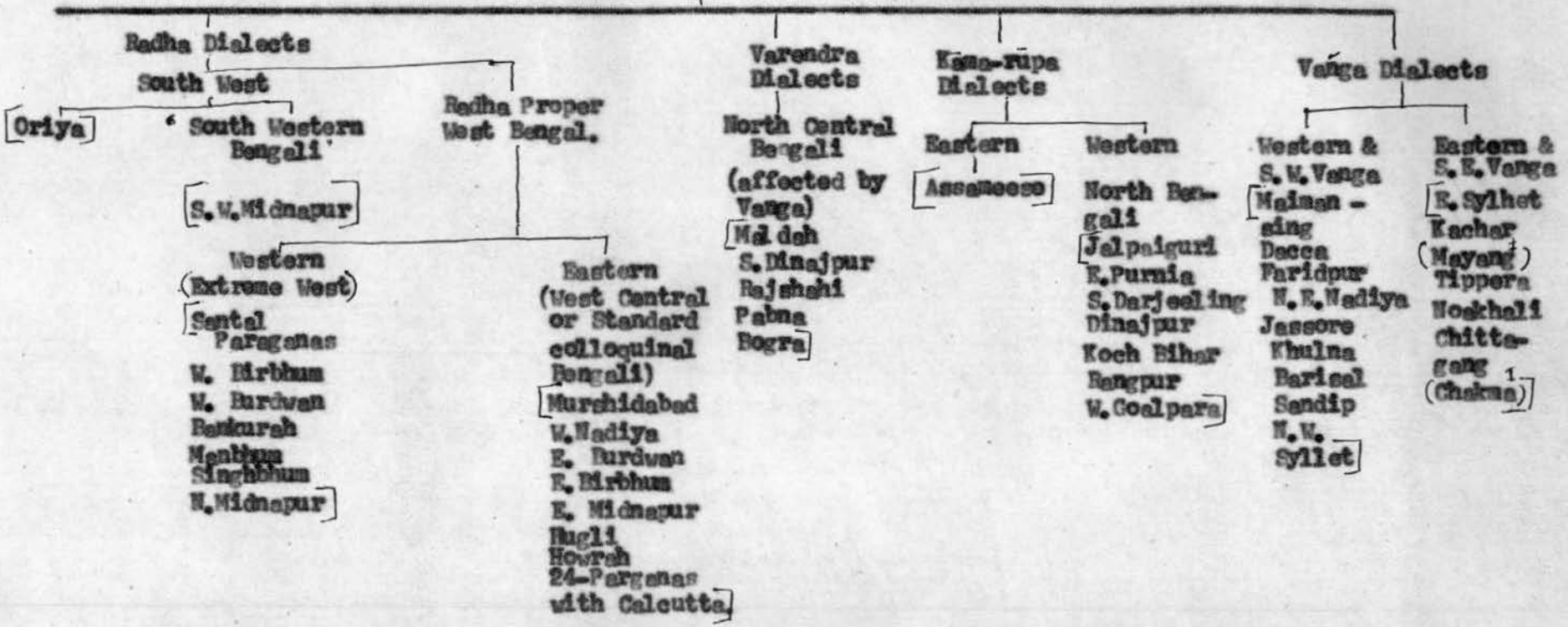

1. Chakma in the dialect of the hill people of Chittaganj. Mayanj or Bishnupuriya is spoken by a few people in Manipur : it is much mixed up with Tibeto-Burman, and in the L.S.I., it is regarded as a dialect of Assamese, but its form show unquestionably a greater affinity with Eastern Vanga.

উল্লিখিত ছক বা ষ্ট tabulation পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মাগধী প্রাকৃত এবং অপভ্রংশস্তর থেকেই বাংলা, আসাম ও ওরিয়্যার আধুনিক ভাষাগুলির (M. I. L.) সৃষ্টি হয়েছে। রাঢ় উপভাষার পশ্চিমবঙ্গীয় পূর্বী শাখা থেকে বর্তমান মান্য (Standard) চলিত বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এবং উড়িয়া ভাষার সৃষ্টি হয়েছে রাঢ় উপভাষার দক্ষিণ-পূর্বী শাখা থেকে। মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশজাত কামরূপী উপভাষার পূর্বী শাখা থেকে অসমীয়া এবং পশ্চিমী শাখা থেকে উত্তরবঙ্গীয় জেলাগুলি-জলপাইগুড়ি, পূর্ব-পূর্ণিয়া, দক্ষিণ-দার্জিলিং, কোচবিহার, রংপুর ও পশ্চিম গোয়ালপাড়া জেলার কথ্য ভাষাগুলির সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী কালে ডঃ সুনীতি কুমার এই কামরূপী উপভাষার পূর্বী শাখাকে তিনি বাংলার রাজবংশী উপভাষা (যৌথিক ভাষা) হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন (৫)।

গ্রীয়ার্সন সাহেব এই কামরূপী উপভাষাকে L. S. I. গ্রন্থে রাজবংশী উপভাষা' বলেই উল্লেখ করেছেন — '' The dialect is usually known as Rajbansi, from the tribe of that name already allowed to "

এই উপভাষাকে আবার 'রংপুরী' বলে উল্লেখ করেছেন পরের লাইনেই " It is also freequently called Rangpuri from one of the districts in which it is spoken.

এই উপভাষার ভৌগোলিক পরিধির বিস্তারভূমি প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই উপভাষা শুধু বাংলাতেই নয় আসামের গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যেও বিস্তৃত রয়েছে। তিনি L. S. I. গ্রন্থে লিখেছেন — The dialect is not confined to the Bengal Province, but extends into the Goalpara district of Assam, in which it gradually merges into Assamese. It is the language of the West and South-West of that district. To the south it is stopped by the Tibeto-Burman languages of the Garo Hills. In Bengal, It is founded on the east mf by the Brahmaputra, which the Garo Hills on the opposite side. In its extreme south-east cornerp it just touches the eastern Bengali of Maimansingh, also across the river. On the south and West it is founded by the Northern Bengali already described, and on the North by the Tibeto Burman languages of the lower Himalayas. It is spoken in following districts, Rangpur, Jalpaiguri, the Tarai of the Darjeeling district, the Native State of Cooch-Behar, together with the portion of of Goalpara in Assam, already mentioned.

আজ থেকে প্রায় এক শতাধিক বৎসর পূর্বে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রীয়ার্সনসাহেব প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজবংশী উপভাষাকে যারা কথ্য হিসেবে ব্যবহার করেন তাদের জেলাভিত্তিক পরিচয় নিম্নরূপ :—[৬]

জেলার নাম	রাজবংশী উপভাষা-ভাষী জনসাধারণের পরিসংখ্যান ।
জলপাইগুড়ী ...	৫, ৬৮, ১৭৬
রঙ্গপুর ...	২০, ৩৭, ৪৬০
কুচবিহার (দেশীয় রাজ্য) ..	৫, ৬২, ৫০০
দার্জিলিঙ (বাহে-উপভাষা) ..	৪৭, ৪৩৫
বাঙ্গলার মোট সংখ্যা	৩২, ১৬, ৩৭১
গোয়ালপাড়া	২, ১২, ৮০০
আসামের মোট সংখ্যা ...	২, ১২, ৮০০
বাঙ্গলা ও আসামসহ সর্ব্বমোট সংখ্যা ...	৩৫, ০১, ১৭১

রাজবংশী উপভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি উল্লেখনীয় বিষয় হোল, গ্রীয়ার্সন সাহেব দার্জিলিঙ জেলার তরাই অঞ্চলের ভাষাকে রাজবংশী উপভাষার বাহে উপভাষা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । তাঁর ভাষায় — In the Darjeeling Tarai, the dialect is influenced by the neighbouring Northern Bengali, and has a special name, as a sub- dialect, viz, Bahē.

বলাই বাহুল্য দার্জিলিঙ জেলার তরাই অঞ্চলের রাজবংশী উপভাষাকে তিনি তাঁর L. S. I. গ্রন্থের তথ্য সংগ্রাহক বাবু প্রসন্নচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত উদাহরণগুলি বাহে উপভাষা-রূপে প্রতিপন্ন করেছেন । বাহে উপভাষার উদাহরণ, যা বাবু প্রসন্ন চন্দ্র দত্ত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সংগ্রহ করেছিলেন তার অংশবিশেষ : —

" অ্যাক্ জনকার দুইটা বেটা ছিল। তারহে বিচৎ ছোট বেটাটা আপনার বাপক্ কোহেল, হে বা। ধন দৌলৎ যেই মুই পাম্ তা মোক্ দে। তাতে অই উমহার দোনো ভাই-এর বিচৎ সমু সম্পত্তি বাটি বাথেরা করে দিলে। কিছুদিন বাদে ছোট বেটা লোটে অ্যাথেটে করিয়া দূর দেশের মুখে চলে গেল, আর উঠে যায়া অনাচার চলন্ চলিয়া সমু সম্পত্তি উড়ায়া ফুরায়া দিলে। পাছৎ দেশৎ বড় আকাল গেল, আর অব্ বড় দুঃখ হবার ধরল, সেলা তার পাছৎ অই যায়া ঐ দেশের এ্যাকজন নগরিয়ার তলে শরণ লিলে ; ঐ নগরিয়াটা অক্ আপনার ভাগাৎ শুয়ার চড়াবার পাঠায়া দিলে।"............

.... সম্ভবতঃ গ্রীয়ার্সন সাহেব তরাই অঞ্চলের রাজবংশী উপভাষাকে বিশেষ নাম 'বাহে উপভাষা' রূপে দেখাতে গিয়ে দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের একটা বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের মনস্তত্ত্বের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। কারণ বাহে শব্দের আক্ষরিক অর্থ ও প্রচলিত অর্থ (সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলায়) যদিও বাবাহে কিংবা বাপুহে কিন্তু রাজবংশী উপভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বাইরের কোন উপভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ তাদের প্রতি 'বাহে' শব্দটি প্রয়োগ করলে নানা অভিজ্ঞতায় প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তা সেই উপভাষা গোষ্ঠীর মানুষকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করারই সামিল হয়ে দাড়ায়। সেজন্য আমার মনে হয় তরাই অঞ্চলের উপভাষা ও বাংলার রাজবংশী উপভাষারই অন্তর্গত। এবং এর বিশেষ নাম 'বাহে উপভাষা' রূপে চিহ্নিত করতে না যাওয়াটাই হবে সমীচিন ও এই অঞ্চলের উপেক্ষিত জনসাধারণের প্রতি মানবিকতাবোধের সুস্থ পরিচয়বোধের প্রকাশ।

এ প্রসঙ্গে রাজবংশী উপভাষার অন্তর্গত পশ্চিম গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুর রাজপরিবারের বিদগ্ধা মহিলা শ্রীমতী নীহারবালা বড়ুয়ার (স্বর্গীয় প্রমথেশ বড়ুয়ার সহোদরা ভগিনী) মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :— "পূর্ব বাংলার উপভাষাভাষীদের যেমন বাঙাল বলে উল্লেখ করা হয়, তেমনি পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে আগত ও বসবাসকারী ভদ্রশ্রেণী এই কোচ রাজবংশীভাষী সম্প্রদায়কে 'বাহে' বলে উল্লেখ করে থাকেন এবং কোচ রাজবংশী ভাষাকেও 'বাহে ভাষা' বলেন। কিন্তু এই কথাটির অর্থ সম্বন্ধে সকলে অবহিত নন, তাই এইকথাটি বর্তমানেও নানারূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছে। অন্যান্য অঞ্চলে অপরিচিত জনকে সম্বোধনকালে যেমন 'ওহে' 'ওগো' ইত্যাদি বলা

হয়, তেমনি কোচ রাজবংশী ভাষায় পুরুষদের 'বাবাহে' এবং মেয়েদের 'মাওহে' বলে সম্বোধন করাই রীতি ও ভদ্রতাসূচক। তারই প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ 'বাহে' ও 'মাহে'। মনে হয়, এই 'বাহে' কথাটির মধ্যে কিছু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি ও অবজ্ঞার আভাস থাকায় হয়তো উত্তরবাংলার শিক্ষিত আদি অধিবাসী সমাজও পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববাংলার ভদ্রসমাজের মতোই কালক্রমে এই কথ্যভাষা পরিত্যাগ করেছেন।"[৮]

এবারে গ্রীয়ার্সন কর্তৃক সংকলিত পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরবর্তী স্থান গোয়ালপাড়া জেলা থেকে আরম্ভ করে সর্বপশ্চিমে দক্ষিণবাহিনী গঙ্গানদীর পূর্ব তীরবর্তী মালদহ জেলা, উত্তরে হিমালয়সংলগ্ন দার্জিলিঙ জেলার তরাই অঞ্চল এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রনদ ও করতোয়া নদী বেষ্টিত রংপুর জেলার বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রচলিত রাজবংশী উপভাষার কথ্যগদ্যরীতির উদাহরণ তুলে ধরা হোল যার দ্বারা আমরা এই রীতির একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারব।

১। রাজবংশী উপভাষা - গোয়ালপাড়া জেলা

তখন তার বড় বেটা পাতার বাড়িত্ আছিল। পাছোত্ তাঁয় আস্তে আস্তে বাড়ির কাছোত যায়া নাচ্ গানের সোর শুনবার পাইল। তখন তাঁয় একজন চেংরাক্ ডাকেয়া পুছ্ করিল্ ইগ্লা কি। তখন তাঁয় তাক্ কৈল্ তোর ভাই আইছে তোর বাপ্ তাক্ ভালে ভালে পায়া একটা বড় ভান্ডরা করুচে। তাতে ওঁয়ায় রাগ হয় উঠিল ভিত্রা সেইল না।

২। রাজবংশী উপভাষা — রংপুর জেলা

বড় ছাওয়া কোনা খেতত আছিল। তায় ফিরিয়া বাড়ীর দোরত আস্নে ঘাটাৎ থাকতে তার বাড়ীৎ নাচন আর গান্শুনিবার পাইলে। তখন তাঁয় উয়ার একজন চাকরক্ ডাকে পুছ্বার ধরলে ইগ্লা কি? তাঁয় উয়াক্ কইলে তোমার ভাই আইসুচে তোমার বাপ্ খুস মতে খাবার বানাইচে। তোমার ভাই ওক ভালমতে পাইচে XX কাজে। এই কতাতে তাঁয় বড় গোসা হইল। তাকি ভিতরত আর না যায়।

৩। রাজবংশী উপভাষা, বাহে উপভাষা তরাই, দার্জিলিঙ জেলা ।

আর অর্ বড় বেটাটা ক্ষেৎবাড়ীৎ ছিল, অই ঘরের নগৎ আসিয়াই নাচ গান শুনা পাল । সেনা অইজ্যাক্‌ঝন্ চাকরক্ নগৎ ডাকায়া পুছারি কোল, ইলা কি হচে ? অই অর্ কয়ল, তোর ভাই আসিছে, তোর বাপ্ খুব খিলান পিলান লাগাইছে, কিত্তায় না অই অর্ ভাল ভাল পাইছে । শুন্দা অই খুব গোসা হোল, উন্দরিতি যাবার চাহে না,

৪। রাজবংশী উপভাষা, - জলপাইগুড়ি জেলা ।

আর অর্ বড় বেটা সেলা খলবাড়ীৎ আছিলা, তাঁয় আসিয়া ঘরের বগলা বগলী হোলে নাচন আর বাজন শুনিবার পাইল । তার পর তাঁয় একঝন্ চাকরক্ বগলেই ডাকায় পুছিল বোলে ইলা কি রে ? চাকরটা অক্ কহিল বোলে তোর ভাই আইচে, তোর বাপ তোর ভাইক ভাল ভাল পায়া খোব ভোজ তৈয়ারি কৈছে । এতে তাঁয় বড্ড রাগ হৈল্ আর ভিতরৎ যবার চাহিল্ নাই ।

৫। কোচ-মিশ্রিত উপভাষা - মালদা জেলা ।

তখুন্ বর ব্যাটা খ্যাতে আছ্‌লো । যখুন অই ঘুর‍্যা আসছিলো, আর বাড়ির কাছে আলো, তখুন্ সে নাচ্‌না বাজ্‌নার আওয়াজ শুনতে পালে । য্যাক্‌টা চাক্‌রকে ডাক্যা সে পুছুলে ইঠে ইসব কি হোছে । চাকর্‌টা অক্ কহলে তোর ভাই আয়্যাছে, অক্ ভালয় ঘুনয় পায়্যাছে কথ্যা তোর বাবা ভোজ দিয়্যাছে । তাঁই গোস্যা হোলো, ঘরেৎ সংধালো না ।

৬। রাজবংশী শ্রীউপভাষা - কোচবিহার রাজ্য (তদানীন্তন)

আর হুরয় তার বড়ো বেটা ক্ষেতোত্ আছিল্, তাঁয় বাড়ীর কাচোৎ আসিয়া শুনিল নাচোন বাইজ বাজ্‌না হবার ধরচে । সেনা তাঁয়্ একজন চাকরোক কাছোত ডাকেয়া পুছিল, এশুলা কি ? তায় তাক্ কইল্, তোমার ভাই আইচে ; তাঁয় ভাল ভালে বাঁচিয়া আইচে সেই বাদে তোমার বাপ খুব খাওয়া দাওয়ার উধ্‌ধুম্ কইরুচে । ওঁয়ার ঐ কাতা শুনিয়া আর্ খাইল্, আর বাড়ী সান্দবার চাইল্ না ।

গ্রীয়ার্সন প্রদত্ত ছয়টি জেলায় প্রচলিত রাজবংশী উপভাষার উদাহরণ যা আমরা পেলাম তার মধ্যে জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া রংপুর ও কুচবিহার জেলায় প্রচলিত রাজবংশী উপভাষার মধ্যে খুব একটা রকমফের নেই বললেই চলে। এর মধ্যে রংপুরের উপভাষার মধ্যে আনুনাসিক ধ্বনির (NASALISATION) কিছুটা আধিক্য পরিলক্ষিত হয় মাত্র। আরাড়া কোচমিশ্রিত মালদহের উপভাষা ও দার্জিলিং জেলার তরাইঅঞ্চলের উপভাষা এই দুটি জেলার উপভাষার সঙ্গে প্রাগুক্ত চারটি জেলার রাজবংশী উপভাষার মধ্যে শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় একারণেই মনে হয় এই সংযোগ আয়তনদুটির (মালদহ ও দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চল) প্রচলিত উপভাষা দুটিকে রাজবংশী উপভাষার উপভাষা রূপে আখ্যাত করার পিছনে কোন অসঙ্গতি কারণ থাকতে পারে না বললেই চলে।

কামরূপী উপভাষা প্রসঙ্গে ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিমত : " এই পশ্চিম কামরূপী উপভাষাই আসলে রাজবংশী। উপভাষা বিচারে আশা করি ভাষাতাত্ত্বিকগণ সুপ্রাচীন রাজবংশী নামটি গ্রহণ করবেন। যদিও ভাষা বা উপভাষার নামকরণ সাধারণতঃ দেশনাম অনুসারে হয়ে থাকে, তবু প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব বিচারে অন্ততঃ বিকল্প নাম হিসাবেও এটি গ্রহণযোগ্য।"[৯] যদিও গ্রীয়ার্সন সাহেবই প্রথম এই কামরূপী উপভাষাটিকে রাজবংশী উপভাষা হিসাবে নামকরণ করেছিলেন তথাপি ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিতগণ এ পর্যন্ত এই নামকরণকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেননি। অবশ্য ভাষাচার্য সুনীতিকুমার এই উপভাষাকে বাংলার রাজবংশী মৌখিকভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তথাপি বাংলার দুই বরেণ্য ভাষাবিদদ্বয় সুনীতিকুমার ও ডঃ সুকুমার সেন এই উপভাষাকে
বঙ্গেই এককালে আখ্যাত করেছিলেন। ভারতীয় ভাষাবিদদের মধ্যে আচার্য সুনীতিকুমারের পর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অসমীয়া ভাষাবিদ ডঃ বাণীকান্ত কাকতী মহাশয় মন্তব্য করেছেন, " গোয়ালপাড়া জিলাত কথিত ভাষার লগত রাজবংশী উপভাষার যথেষ্ট রূপে মিলন ঘটা যেন লাগে। এই রাজবংশী উপভাষাটো কোচবিহারর কোচরজা সকলর দিনত ক্রমবিকশিত হৈছিল।"[১০] ✗
(পশ্চিম অসমর ভাষা ডঃ উপেন্দ্র নাথ গোস্বামী, অসম সাহিত্যসভা স্মৃতিগ্রন্থ, ১১৭২ পৃঃ ৩১)

সম্প্রদায়ের আদি অধিবাসীবৃন্দ এখনো এই কোচ-রাজবংশী ভাষাকেই কথ্য ভাষারূপে ব্যবহার করে থাকেন। তারও কারণ স্বরূপ বলা যায়, কোচরাজ্য প্রতিষ্ঠা (এবং রাজবংশের হিন্দু-ধর্ম গ্রহণের) পর যে সময়কে তার স্বর্ণযুগ বলা হয় সে সময়ে তাঁদের রাজধানীকে কেন্দ্র করে কোচপ্রধান সমগ্র উত্তরবঙ্গেই তার আঞ্চলিকতা নিয়ে এই উপভাষা বিস্তার লাভ করেছিল। সেই ভাষা পরবর্তীকালেও কোচবিহারের রাজপরিবার শেষ পর্যন্তই ব্যবহার করে গিয়েছেন। এই রাজপরিবার পাশ্চাত্যশিক্ষা ও বৈদেশিক আচার ব্যবহারেই অভ্যস্ত ছিলেন, এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রদেশাগত মহধর্মিনীরাও কথ্যভাষারূপে এই ..... ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন। সেই জন্যই হয়তো স্থানীয় ভদ্রসমাজ ও তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলগুলি বাংলার অন্যান্য উপভাষা ও প্রভাব সত্ত্বেও রাজভাষাকে অবহেলা করার প্রয়োজন বোধ করেনি।"[১১]

কামরূপী উপভাষার গদ্যরীতিবিচার।

কামরূপী উপভাষার গদ্যরীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই সর্বাগ্রে যার কথা মনে আসে তিনি হলেন কামতারাজ নরনারায়ণ। পালবংশের ধ্বংসের পর কামরূপ রাজ্য ভেঙে গেলে নীলধ্বজ কর্তৃক খেন বংশের প্রতিষ্ঠা হয় তখনই রাজ্যের নাম কামরূপ স্থলে কামতার সন্ধান আমরা পাই। খেনবংশের মাত্র তিন পুরুষের শাসনের পর কোচবংশের রাজা বিশ্বসিংহ কামতাপুরের অধিপতি হন। তাঁরই সুযোগ্য সন্তান মহারাজ নর নারায়ণ বর্তমান কোচবিহারে রাজধানী স্থাপন করে কামতা রাজ্য পরিচালনা করেন। আহোমরাজ চুকাম্‌ফাকে পরাজিত করে তিনি তার অনুজ চিলারায়ের সৈন্যপত্যে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বর্তমান আসাম রাজ্য ছাড়াও সুরমা উপত্যকার কাছাড় এবং মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়ের অন্তর্গত খাসি জয়ন্তীয়া গারো পাহাড় ও পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে পরিগণিত হন। সেই সময়ে বর্তমান উত্তরবঙ্গ ব্যতীরেকেও উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রশাসন সমগ্র ভূখণ্ডে রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার করা হোত তা বলাই বাহুল্য। মহারাজ নরনারায়ণ প্রবর্তিত এই কামরূপী উপভাষা মতান্তরে যার নাম রাজবংশী উপভাষা বলা হয়। আহোমরাজ চুকাম্‌ফাকে লেখা মহারাজ নরনারায়ণের চিঠিটি আজ থেকে (১৯৮১) চারশো সাতাশ বৎসর পূর্বে লিখিত হয় এবং তাইই আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের সর্বপ্রথম প্রামাণিক উদাহরণ স্বরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চিঠিখানির অংশবিশেষ –

.... লিখনং কার্যঞ্চ । এথা আমার কুশল । তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি । তখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে । তোমার আমার কর্তব্য সে বর্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফল হইবেক । আমরা সেই উদ্যোগত আছি । তোমারে এগোট কর্তব্য উচিত হয়, না কর তাক আপনে জান । অধিক কি লেখিম । সত্যানন্দ কর্মী রামেশ্বর শর্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দার উদণ্ড চাউনিয়া ইমারাক পাঠাইতেছি । তামারার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা ।

পত্রটি প্রসঙ্গে ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন

"তখনকার দিনে লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রয়োগ ছিল শুধু চিঠিপত্রাদিতে ও দলিল দস্তাবেজে । ষোড়শ শতকে লেখা চিঠি শুধু একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে । পত্রটি ১৪৭৭ শকাব্দে (খৃষ্টীয় ১৫৫৫ সালে) লিখিত হয় । (কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ এই পত্রটি আহোমরাজ চুকম্ফা স্বর্গদেবকে লেখেন ।) এই পত্রটির মধ্যে বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব প্রত্যন্তের উপভাষার অনেকগুলি শব্দ আছে । তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে যে ষোড়শ শতকের মধ্য ভাষা সাধুভাষার রূপ বাঙ্গালা গদ্য একরকম দাঁড়াইয়া গিয়াছে ।[১২]

পত্রটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিশ্লেষণে দেখা যায় তৎসম শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কামরূপী উপভাষার শব্দ, ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ব্যবহারও এতে রয়েছে । যেমন –

তোমারো, সম্মানসূচক আপনি অর্থে আপনারা । গোট - গোটায়, সব । লেখিম-লিখব । ইমারাক - এদের । তামারার - তাহাদের তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি । এখানে তোমার অর্থে আপনার । বর্তমানেও শব্দটি কামরূপী উপভাষায় মধ্যমপুরুষের সর্বনাম পদরূপে ব্যবহৃত হয় । যেমন - 'তোমরা কেমন আছেন ? তোমার বাড়ীৎ কায় কেমন আছে ? ইত্যাদি ।

মহারাজ নরনারায়ণের রাজসভায় গদ্যসাহিত্যেরও যে চর্চা ছিল তারও প্রমাণ পাই আমরা ভট্টদেব বা বৈকুণ্ঠ নাথ ভট্টদেবের রচিত কথাগীতা ও কথাভাগবত নামক দুটি গদ্য সাহিত্য গ্রন্থে । সুতরাং ডঃ সুকুমার সেন যে বলেছেন তখনকার দিনে লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রয়োগ ছিল শুধু চিঠিপত্রাদিতে এ কথাও মনে হয় মেনে নেয়া

89852
4 JUN 1995
NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY RAJA RAMMOHUNPUR

কষ্টসাধ্য। কারণ কুচবিহার রাজদরবারে রচিত ভট্টদেবের গদ্যসাহিত্য কথা ভাগবত সম্পর্কে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিঃসন্দেহে কামরূপী কিংবা রাজবংশী উপজাতীয় মানুষদের পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়। তিনি লিখেছেন - "The people who could write Gita in such prose in the sixteenth century was not a small people"

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ "কথাগীতা" পড়ার পর পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামীকে লিখেছেন "You may very well be proud of the author of this book who could handle prose in such a remarkable lucid style more than a century before we had any prose in Bengali".

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কথাগীতা সম্বন্ধে অভিমত দিয়েছেন -

"Indeed the Prose Geeta of Bhattadeva composed in the sixteenth century is unique of its kind. ... It is a priceless treasure."[১৪]

শংকরদেবের দুজন প্রধান শিষ্য একজন কায়স্থ মাধবদেব অন্যজন ব্রাহ্মণ দামোদরদেব। এই দামোদরদেব যখন চিলারায় - শৈত্র পরীক্ষিত নারায়ণ এর অধীনস্থ পূর্ব কামতার তদানীন্তন নাম কোচ রাজ্যের অন্তর্গত পাটবাউসীতে অবস্থানকালীন ভট্টদেবকে গদ্যে স্ত্রী ও শূদ্র যাতে বুঝতে পারে তজ্জন্য ভাগবত লিখতে আদেশ করেন। তদনুযায়ী ১৫৯৩ থেকে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কথা ভাগবত লেখেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ভট্টদেবকে নরনারায়ণের আমলের গদ্য লেখক বলে যে অনুমান করেছেন তা সঠিক নয়।[১৫] প্রকৃতপক্ষে মহারাজ নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ যখন কোচবিহারে রাজত্ব করেন সেসময়ে ভট্টদেবের গুরু দামোদরদেব কোচবিহারে (মধুপুর মতে) অবস্থান করেন। কোচবিহারে গুরু দামোদরদেবকে কথা ভাগবত দেখান ও রাজদরবারে কথা ভাগবত যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে। কথা ভাগবত গ্রন্থের গদ্যের উদাহরণ যেন মনুষ্যে জীর্ণবস্ত্রক পরিত্যাগ করি, নবীন বস্ত্রক গ্রহণ করে, এমনে আত্মায়ো পুরাণদেহক এড়ি নবীনদেহক স্বীকার করে ; কর্ম নিবন্ধ নতুন দেহ অবশ্যে হৈব। জীর্ণ দেহ নাশত শোক করিতে নালোগে। এই আত্মাক অস্ত্রো না কাটে, অগ্নিয়ো নদহে, হলেও কোমল নকরে, বায়ুয়ো নুশু খায়ে। এতেকে অচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্য নিত্য সর্বগত অচল সনাতন অব্যক্ত অচিন্ত্য অপ্রাপ্য করি কহে।"[১৬]

ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় আবার ফিরে আসি তিনি বলেছেন, "বাংলা গদ্যকে রাজ শাসনকার্যে ব্যবহার করেছিলেন মহারাজ নরনারায়ণ" । এ কোন বাংলা গদ্য ? নিশ্চয় কামরূপী উপভাষায় রচিত বাংলা গদ্য যার প্রথম উদাহরণ স্বয়ং মহারাজ নরনারায়ণের পত্রখানি যা আহোমরাজ চুকামফাকে লেখা হয়েছিল । মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালের পর দু'শ বছর কম করেও এই গদ্যরীতিতে সমগ্র পূর্ব ভারতের সরকারী রাজকর্মে দলিল দস্তাবেজের কাজে ব্যবহৃত হোত ।

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়

বর্তমানে উত্তরবঙ্গ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ এই পাচটি জেলাকে সূচিত করে । এই জেলা পাঁচটির মোট আয়তন ৮,৪০০ বর্গমাইল । এছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির পরিধি-যুক্ত আয়তন অনুমানিক ৫,০০০ বর্গমাইল । এই অঞ্চলগুলি হোল রংপুর, পূর্ব দিনাজপুর ও জামালপুর মহকুমা (মৈমনসিংহ) । তাছাড়া বিহার-এর অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা ও উত্তরবঙ্গের কামরূপী উপভাষা ও লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত ভৌগোলিক অঞ্চলবিশেষ ।

ভারত ও বাংলাদেশের এই সুবিস্তীর্ণ ভূ-ভাগেই রাজবংশী ক্ষত্রিয় (ও তার সমগোত্রীয় কোচ, পলিয়া, দেশীয়া) জাতি-প্রভাবিত সংস্কৃতির ভৌগোলিক সীমারেখা বলে নির্ণয় করা যেতে পারে ।

পৌরাণিক কালে উত্তরবঙ্গের পরিচিতি ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর নামে । অবশ্য তখন এর রাজধানীর উল্লেখ বর্তমান কামরূপ জেলার মধ্যেই অনুমান করা হয়েছে । ঐতিহাসিক কাল থেকে উত্তরবঙ্গের নাম কামরূপ - কামতা ও কামতাপুর নামেই পাওয়া যায় । আবার উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত ছিল । এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে পলিয়াও দেশীয়া রয়েছেন যাদের সঙ্গে রাজবংশী সমাজের সামাজিক আচার ব্যবহার এর যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখা যায় ।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মগধরাজ্য স্থাপিত হয় । এই সমসাময়িক কালে সমগ্র উত্তরবঙ্গ পশ্চিমে ত্রিস্রোতা (তিস্তা) এবং দক্ষিণ পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত সহ মৌর্যসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয় । ঐতিহাসিক কে. এন. বড়ুয়া মহাশয় ও এই মতবাদ সমর্থন করেন –

"The Mourya Empire of Asoka Undoubtedly included Northern Bengal between Teesta (Karatoya) and the Kosi, for within this area stupas erected by Asoka were found by Yuan Chawing in the Seventh Century A.D."১৭

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রংপুর থেকে প্রকাশিত 'কামরূপ শাসনাবলী'র সংকলক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ঐ গ্রন্থের রাজাবলী পর্বের মহাভারতের সভাপর্বে অর্জুন কর্তৃক উত্তরদিগবিজয় বর্ণনায় প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তের সঙ্গে সখ্যতার উল্লেখ করেছেন। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশম এর ৪।৮১ শ্লোকে প্রাগজ্যোতিষপুরের নামের সঙ্গে 'কামরূপ' নাম ও পাই। এই কামরূপ নামের সঙ্গে যার নাম ইতিহাসে সর্বাধিক পরিচিতি তিনি ভাস্করবর্মা। কামরূপের আয়তন সম্পর্কে কালিকাপুরাণ, কামাখ্যাতন্ত্র ও যোগিনীতন্ত্রে উল্লেখ আছে। সব তন্ত্রের ধারণাও এক নয়। কালিকাপুরাণে আছে নারায়ণ পূর্বদিকে ললিতকান্তার এবং পশ্চিমে করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ নরককে দিয়েছিলেন। এই কামরূপদেশ তখন রত্নপীঠ, স্বর্ণপীঠ, কামপীঠ ও সৌমারপীঠ এই চার পীঠে বিভক্ত ছিল। রত্নপীঠ ও কামপীঠই পরবর্তীকালে কামতাপুর নামে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে। অধুনা এই কামতাপুরের প্রায় সমগ্র ভূ-ভাগকেই উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির পরিধিযুক্ত অঞ্চল বলা চলে। বিখ্যাতি চৈনিক পরিব্রাজক হিউ.এন. সাঙ (YUAN CHANG) তদানীন্তন কামরূপ অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের প্রশংসা করে গিয়েছেন। তিনি দেখেছেন এখানকার লোকের আচার ব্যবহার সৎ ছিল, তারা সরল ও অধ্যয়নশীল ছিলেন, দেবদেবীর পূজো করতেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি আস্থাবান ছিলেন না। বর্মন বংশ শুঙ্গের পর কিছুকাল কামরূপে পালবংশের রাজারা রাজত্ব করেন। আনুমানিক দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে কামরূপরাজ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। প্রায় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী বিরোধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চলতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খ্যেন বংশের মাধ্যমে আসামের পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গ নিয়ে প্রথম 'কামতাপুর' রাজ্যের সৃষ্টি হয়। শাসকুল ছিলেন খ্যেন বংশজাত। এই বংশের মাত্র তিনজন রাজার নাম জানা যায়। তারা হলেন নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর। রাজা নীলাম্বরের সময়কালে (খৃঃ ১৪৭৩ - ১৪৯৮।৯৯) সুলতান হোসেন শাহ খ্যেনবংশ

প্রতিষ্ঠিত কামতাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন ও পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করেন। অনেকের মতে এই খেন বংশ কোচ রাজবংশেরই একটি শাখা। আবার অনেকে এই মতকে অস্বীকার করেন। যাই হোক পরবর্তীকালে দেখা যায় হরিদাস বা হারিয়া মণ্ডল এর পুত্র বিশ্বসিংহ (১৪৯৬-১৫৩৩ খৃঃ) পুনরায় কামতাপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ও সার্বভৌম কোচরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

পণ্ডিতপ্রবর পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের মতে, "এই কামরূপই সম্ভবতঃ 'কামতা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কোচবিহার রাজধানীর ১৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।"[১৮] আসামের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক - ডঃ সূর্য্য কুমার ভুঁইয়ার মতে "Kamrupa was dismembered about the twelfth century and a new Kingdom known as Kamata, came into being with its capital at Kamatapur, at a distance of some eighteen miles from Cooch-Behar. Kamata extended from the river Barnadi, opposite Gauhati, on the east, and it comprised the present districts of Rungpur, Cooch-Behar, Goalpara and Kamrupa ".[১৯] এই কামতাপুরেরই ক্রমবিবর্তিত ও ক্রমসঙ্কুচিত রূপই ছিল ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহার নামক দেশীয় নরপতি (মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর) শাসিত রাজ্য যা পরবর্তীকালে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে পরিচিত হয়।

বিশ্বসিংহের দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকাল সম্বন্ধে (১৫৩৩ - ১৫৮৭ খ্রীঃ) এর ডঃ সূর্য্যকুমার ভুঁয়া বলেছেন, "The measure of king Naranarayan places him on the same line with Alfred, Akbar."[২০] মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালের সংস্কৃতিচর্চা ঐতিহাসিক কে.এন.বড়ুয়া মহাশয় 'এলিজাবেথীয় যুগের' সাথে তুলনা করেছেন। মহারাজা নরনারায়ণের আনুকূল্য ও তত্ত্বাবধানে শংকরদেব ও মাধবদেব ছাড়াও রামসরস্বতী, অনন্তকন্দলী, বিষ্ণুভারতী, চন্দ্রচূড় আদিত্য শ্রীধর কন্দলী, নরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ পণ্ডিত ও বৈষ্ণব কবিগণ ও কামতা রাজসভাকে অলঙ্কৃত করেন।

রাজ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ অদ্বিতীয় বীর হিসাবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি যুদ্ধকালে চিলের মত ছোঁ মেরে শত্রুব্যূহ বিধ্বস্ত করতেন বলে তাকে চিলারায় নামেও পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "তাঁহার পরাক্রমে উত্তরবঙ্গ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত কুচবিহারের প্রভুত্ব বিস্তার হইয়াছিল। আহোমরাজ সুখানপা তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও জৈন্তিয়ার রাজগণ কুচবিহারের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"[১১] এই রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রমাণস্বরূপ মহারাজ নরনারায়ণ প্রবর্ত্তিত স্বর্ণ[১২] ও রৌপ্য নির্মিত 'নারায়ণী মুদ্রা বহুদিন পর্য্যন্ত দেশ বিদেশে প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের ভাষায়, উত্তরবঙ্গ, আসাম, মণিপুর রাজ্যের তো কথাই নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বত ও ভুটানের বাজারে ও কুচবিহারের নারায়ণী টাকার আদান প্রদান হইত। খৃষ্টীয় ১৮০০ সালে সার্বভৌম ব্রিটিশ শক্তির নির্দেশে পরাধীন কুচবিহারের টাকশাল বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তাহার পরেও প্রায় চল্লিশ বৎসর কুচবিহারে এই টাকার প্রচলন ছিল।"[১৩]

১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণের পরলোকগমনের পর কামতারাজ্য গৃহবিবাদের ফলে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কোচবিহারকে রাজধানী করে মহারাজ নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ পশ্চিম কামতার রাজপদে অভিষিক্ত হন ও বর্ত্তমান কামরূপ জেলার 'কোচ হাজো' তে রাজধানী স্থাপন করে শুক্লধ্বজ (চিলারায়) পুত্র রঘুদেব-নারায়ণ পূর্বকামতার রাজ পদ অধিকার করেন। পরবর্ত্তীকালে ক্রমানুয়ে রঘুদেব নারায়ণের পর পরিক্ষীণ নারায়ণ রাজত্ব করার পর কোচ হাজো তে গৃহবিবাদ সুরু হয় ও ফলে ব্রিটিশ আগমনে কোচ হাজোর অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। এদিকে কোচবিহারে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের (১৫৮৭-১৬২১) পর ক্রমানুয়ে ঊনবিংশতিতম মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের (১৮৬৩-১৯১১) রাজত্বকালে আধুনিক কোচবিহার রাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতিদেবীকে বিবাহ করার পর কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের এক নবযুগের সূচনা হয়।

কামরূপী উপভাষা মণ্ডল-এর জনসাধারণের পরিচয় ।

পুরুলিয়া উত্তর অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে কোচ-রাজবংশী, পলিয়া, দেশীয়া এই চারটি গোষ্ঠী মূলতঃ একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মানুষ বলে নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণ প্রায় একমত । তবে কোচ-এর সাথে রাজবংশী ও পলিয়া দেশীয়াদের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রচুর মতপার্থক্য দেখা যায় । রাজবংশী ক্ষত্রিয়জাতির গুণী রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মন মহাশয় বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত গ্রহণ করে আজ থেকে প্রায় আশী বৎসর পূর্বে রাজবংশী সমাজকে ক্ষত্রিয় হিসাবে উপবীত গ্রহণের অধিকার দান করেন । ফলে যারা ক্ষত্রিয় হলেন না তাদের সম্পর্কে ধর্মের ভিত্তিতে একটা সীমারেখা টেনেছিলেন । এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিছু পুরাণ যথা যোগিনীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ থেকেও শাস্ত্রীয় উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করলেন যে রাজবংশীগণ কোচ থেকে পৃথক জাতি । আমরা রায়-সাহেব পঞ্চানন বর্মন মহাশয়ের শাস্ত্রীয় মতামত সম্পর্কে কোন বলতে চাইনা । তবে বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা যখন নিজেরাই এ ব্যাপারে একমত নন তখন নিঃসন্দেহে বলা চলেনা যে কোচ ও রাজবংশী এক কিংবা পৃথক জাতি ।

বিশিষ্ট ভারত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হজসনের মতে কোচরা বোডো ও ধীমাল গোষ্ঠীর অন্তর্গত । বুকানন হ্যামিলটন সাহেবও অনুরূপ মতপোষণ করেন । নৃতত্ত্ববিদ ডালটন ও প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কোচদের দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোক বলে অনুমান করেছেন । রিজলী সাহেবের ধারণা মঙ্গোল ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংমিশ্রিত জাতি এই কোচেরা যদিও দ্রাবিড়দের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য অধিক । ঐতিহাসিক গেইট বলেছেন কোচরা সাধারণভাবে রাজবংশী সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং রাজবংশীদের সম্বন্ধে ভাষাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের মতপার্থক্য থাকার জন্য কোচদের সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায় ।

আমার মনে হয় কোচ ও রাজবংশীয়েরা মূলতঃ মঙ্গোলীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী পরবর্তীকালে এদের মধ্যে আর্যীকরণ হতে থাকে । এজন্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, "The masses of North Bengal areas are very largely of Bodo origin, or mixed Austric-Dravidian -Mongoloid, ... They can now mainly be described as Koch, i.e.,

Hinduised or semi Hinduised Bodo who have abandoned their original Tibeto-Burman speech and have adopted the Northern Dialect of Bengali (which has a close affimity with Assamese)."
বাংলার অপরাপর জাতির মধ্যে যেমন মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি এদের বেলাতেও হয়েছে তাই বলা যায় যে, কোচ ও রাজবংশী মূলতঃ মঙ্গোলীয়ান ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর একটি মিশ্রিত শাখা বিশেষ। এবং এদের মধ্যে পলিয়া ও দেশীয়াদের ও মিল রয়েছে। তবে পলিয়া দেশীয়াদের প্রধানতঃ দেখা যায় দিনাজপুর মালদহ নেপালের মোরাঙ ও বিহারের কিষাণগঞ্জ অঞ্চলে।

কোচ-হাজং-এরাও প্রধানতঃ মঙ্গোলীয়ান শাখার অর্ন্তগত একটি গোষ্ঠী। মৈমনসিংহে এর জামালপুর মহকুমা ও গারো পাহাড়ের মধ্যে ও গোয়ালপাড়া জেলাতেও এরা অধিকসংখ্যায় বাস করেন। খোনদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে কামতাপুরে খোন রাজত্বকালে যে রাজাদের নাম আমরা পাই কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁদের কোচ-রাজবংশী বলে উল্লেখ করেছেন। তবে নৃতত্ত্বের বিচারে খোনদের মধ্যে কোচদের মত যে মঙ্গোলীয়ান রক্তের ধারা অনেক কম এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। কলিতা জাতি সম্পর্কে কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেছেন যে এরা কোচ রাজত্বকালে কামতাপুর রাজ্যে কোচ ও রাজবংশী সমাজের পূজাপার্বণে পৌরোহিত্য করতেন এবং এদের সাথে বর্তমানে রাজবংশী সমাজের নিজস্ব পুরোহিত অধিকারীদের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। বর্তমানে এরা আসামের গোয়ালপাড়া জেলাও কামরূপ জেলায় বাংলার বৈদ্যসমাজের মত একটি শিক্ষিত জাতি বিশেষ। যুগী বা নাথ সম্প্রদায়ের ধর্ম নাথ ধর্ম। ঐতিহাসিক খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা এদের সম্পর্কে বলেছেন যে এরা পশ্চিমকামরূপে চুন প্রস্তুত করেন ও শঙ্খ ব্যবসায় করেন। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম কামরূপের অনেকস্থানে এদের গুরু গোরক্ষনাথের স্মৃতি বহন করে আসছে যেমন, গারো পাহার, বগুরায় গোরক্ষনাথের মন্দির, রংপুরের গোরক্ষমণ্ডপ। গোয়ালপাড়ায় যোগীঘোপা প্রভৃতি। উঁইমানী ও হীরা নামেও দুটি সমাজ আছে। উঁইমানীরা ক্রমানুয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মিশে যাচ্ছে। হীরাদের সংখ্যাও অনেক কমে আসছে। বর্তমানে এদের গোয়ালপাড়া জেলার বিলাসীপাড়া থানায় হীরাপাড়া নামে একগ্রামে একত্রে বসতি স্থাপন করতে দেখা যায়। তবে জেলার অন্যত্রও এদের দেখা যায়। এদের সম্পর্কে বাংলায় কুক্তকারের পার্থক্য দেখিয়ে E. H. Pakyntein সাহেব লিখেছেন।

"Hira is the name of a caste of Potters distinguished from Kumbhakar's by the fact that their workers are women, who shape the nessels by hand, without the assistance of potters wheel."

প্রকৃতপক্ষে অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা মূলতঃ দুটি ভাগে ও বিভক্ত একটি হলেন পাশ্চাত্য বৈদিক আরেকটি মৈথিলী ব্রাহ্মণ । পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কোচবিহার সহরের থাগড়া বাড়ী গ্রামে বাস করেন ও গোয়ালপাড়া জেলাতেও এঁরা আছেন । কোচবিহারের মদন মোন বাড়ীর পূজা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা করেন । অনুমান করা হয় এঁরা মহারাজা নরনারায়ণের সময় থেকেই এতদঞ্চলে আসেন । পরবর্তীকালে দ্বারভাঙ্গা থেকে মৈথিলী ব্রাহ্মণেরাও এতদঞ্চলে আসেন । এদের উপাধী সাধারণতঃ ঝা, ওঝা, পাঠক, উপাধ্যায় ও মিশ্র । উত্তরবঙ্গের সর্বত্র এঁরা আছেন । তবে মালদহ জেলায় এদের সংখ্যা অন্যান্য জেলার তুলনায় অধিক বলে অনুমিত হয় । কোচবিহার বাণেশ্বর মন্দির ও দিনহাটার কামতাপুর পড়ের নিকটবর্তী গোসানীমারী মন্দিরের মৈথিলী ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে কোচবিহারের মহারাজারা সুদীর্ঘকাল পূর্বেই পূজার্চ্চনার ভার দেন ও নিষ্কর দেবোত্তর সম্পত্তিও দেন ।

এঁরা ছাড়াও আদিবাসী সমাজের মধ্যে মঙ্গোলীয়ান বংশোদ্ভূত মেচ বা বোডো, রাভা, গারোরাও আছেন । তাছাড়া রয়েছে মুসলমান সমাজের মানুষেরা যাদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার বাদি দিয়ে আচার আচরণ অনেকটা রাজবংশীদের মত ।

বাংলা ও আসামের সংস্কৃতিতে কামরূপী উপজাতি মণ্ডল - এর লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক ও গুরুত্ব বিচার ।

কামরূপী উপজাতি মণ্ডল এর লোকসংস্কৃতির এলাকার একদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ অন্যদিকে গঙ্গা । একদিকে ব্রহ্মপুত্রের ওপারে কামরূপ জেলা অন্যদিকে গঙ্গার ওপারে মুর্শিদাবাদ জেলা । মধ্যের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কখনো বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে কখনো বা কম তেমনি এই অঞ্চলে কখনো অসমীয়া লোকসংস্কৃতির প্রভাব বেশি পড়েছে কখনো বা কম । বাংলার ঘুনাই যাত্রা, বাইদ্যা বাইদ্যানীর ভাটিয়ালী ঢঙের গানের সুর ও ভাষা যেমন এদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে তেমনি আসামের বিহু উৎসবের ঢেউ ও গোয়ালপাড়া জেলার লোকজীবনে আছড়ে পড়েছে । তেমনি গৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। যদিও একথা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা যে এতদঞ্চলের রাজবংশী সমাজের লোকসংস্কৃতির একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে তার গানে, গাথায় জীবন আচরণে তথাপি আমরা বলতে পারি দু'পাশে দুটি ভগিনী স্থানীয় লোকসংস্কৃতির পরিমণ্ডলের মধ্যবর্তী স্থানে এই কামরূপী উপভাষামণ্ডল এর ভৌগোলিক অবস্থান থাকায় অনিবার্যভাবে তাদের প্রভাব এদের ওপর নানাভাবে পড়েছে ফলে একটি মিশ্র সংস্কৃতির ও সৃষ্টি হয়েছে।

কামরূপী উপভাষা মণ্ডল এর লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

বাংলার লোকসাহিত্যের সঙ্গে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যের যথেষ্ট মিল রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যবোধ। আসামের লোকসাহিত্য সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

কামরূপী উপভাষা মণ্ডল এর লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার গাথায় রয়েছে যেমন ময়নামতী গোপীচন্দ্রের গানে। পক্ষান্তরে বাংলার রয়েছে পূর্ববঙ্গগীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকা। ব্রতকথায় বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার সুবচনী, কড়াকড়ির ব্রতে। ঐক্য রয়েছে প্রবাদও ধাঁধার মধ্যে যদিও ভাষার স্বাতন্ত্র্যতা উভয়ক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। রূপকথা, উপকথা, ছড়ার ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য।

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক গানে আছে ভাওয়াইয়া। চট্কা গান পক্ষান্তরে বাংলায় রয়েছে জারি, সারি, ভাটিয়ালী, টুসু, ভাদু, গাজনচের গান ইত্যাদি। পালা-গানে আছে এখানকার বিশিষ্টতা যেমন – বেণাকুপান, বিষহরা, চোর-চুরণী, ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আধ্যাত্মিক গানেও বিশিষ্টতা আছে যেমন, মনোশিক্ষা, দুক্ষা, মইচ্ছা প্রভৃতি। লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আসামের বিহু সঙ্গীত এর সাথে ভাওয়াইয়ায় অনেকটা মিল দেখা যায়। বিহু গান যেমন মূলতঃ প্রেমসঙ্গীত ভাওয়াইয়া গানও তাই। বিহু গানের একটি কলিতে আছে, '' এনে ফাগুন মহীয়া তোমার যৌবন ফুলিলে
মন মোর খেলিছে তাত।"

গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়া গানে আছে –

"চালুয়া খোপা মটুকচুল শাড়ীর অঞ্চলে মন মোর উড়ায় নারে
আজি তোর নারীর নব যৌবন তাকে দেখিয়া মন মোর ঢুল খেলায় রে।"

তাছাড়া আসামের লোকসঙ্গীতের আইনাম, জিকির (মুসলমানী) এগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের

লোকসাহিত্যে নেই। পক্ষান্তরে আসামের ও বাগানির সঙ্গে বিষহরা বা পদ্মাপুরাণের ভাব ও সুরের নৈকট্য পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা চলে বাংলা ও আসামের লোকসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় উভয় অঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকসাহিত্যের মধ্যে ঐক্য ও যেমন আছে তেমনি আছে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ যা নিজ মহিমায় হয়ে আছে উজ্জ্বল।

প্রমাণপঞ্জী

১। গোপীচন্দ্রের গান। ক. বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভূমিকা।

২। L.S.I. Vol I by G.A. Grierson.

৩। The Cooch-Behar State Library Bengali MSS Catalogue, 1948
ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ।

৪। O.D.B.L. part I Introduction Chapter 139

৫। সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, নবীন সংস্করণ পৃঃ ৩৫ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬, ৭। L.S.I. P. 163 V. Rajbansi.

৮। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪

৯। লোকশিল্প ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। আগস্ট ১৯৭৪

১০। Kakati, B. A.F.D., 1941, P. 34.
ডঃ উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী রচিত পশ্চিম আসামর ভাষা। অসম সাহিত্য সভা স্মৃতিগ্রন্থ ১৯৭২ পৃঃ ৩১

১১। বিশ্বভারতী পত্রিকা। বৈশাখ, আষাঢ় ১৩৬৪

১২। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য পৃঃ ৫। ডঃ সুকুমার সেন।

১৩।১৪। কথা ভাগবত ১ম স্কন্ধ বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য রচিত - ও হরিনাথ শর্মা দলৈ সম্পাদিত ভূমিকা পৃঃ ২১

১৫। উল্টোরথ পত্রিকা অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৫ 'উপেক্ষিত বর্ষাগীতে' পৃঃ ১৮৩

১৬। কথাগীতা পৃঃ ১৩

১৭। Early History of Kamrupa by K.L. Barua

১৮। কামরূপ শাসনাবলী ৩০ পৃ

১৯, ২০। Studies in the literature of Assam, 1956 P.5 & P 76-77

২১। প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন । ক.বি. ১৯৪২ ভূমিকা

২২। Kirata-Jana-Kriti by Dr. Sunity Kumar Chatterjee
"A unique commemoratine gold coin a sort of memorial medal - of the Koch King Nara-narayan has been discovered by Sri Vasanta Chaudhury and Sri Parimal Ray " XIX.

২৩। প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন । ক.বি. ১৯৪২ ভূমিকা ।

২৪। Kirat - Jana - Kriti P. 112 by XX. S. K. Chatterjee.

২৫। Cencus of India 1911, Vol III Assam Part VA.

স্কেল - ইংরাজী মাইল

০ ১০ ২০

প্রকল্পভুক্ত অঞ্চলের মানচিত্র

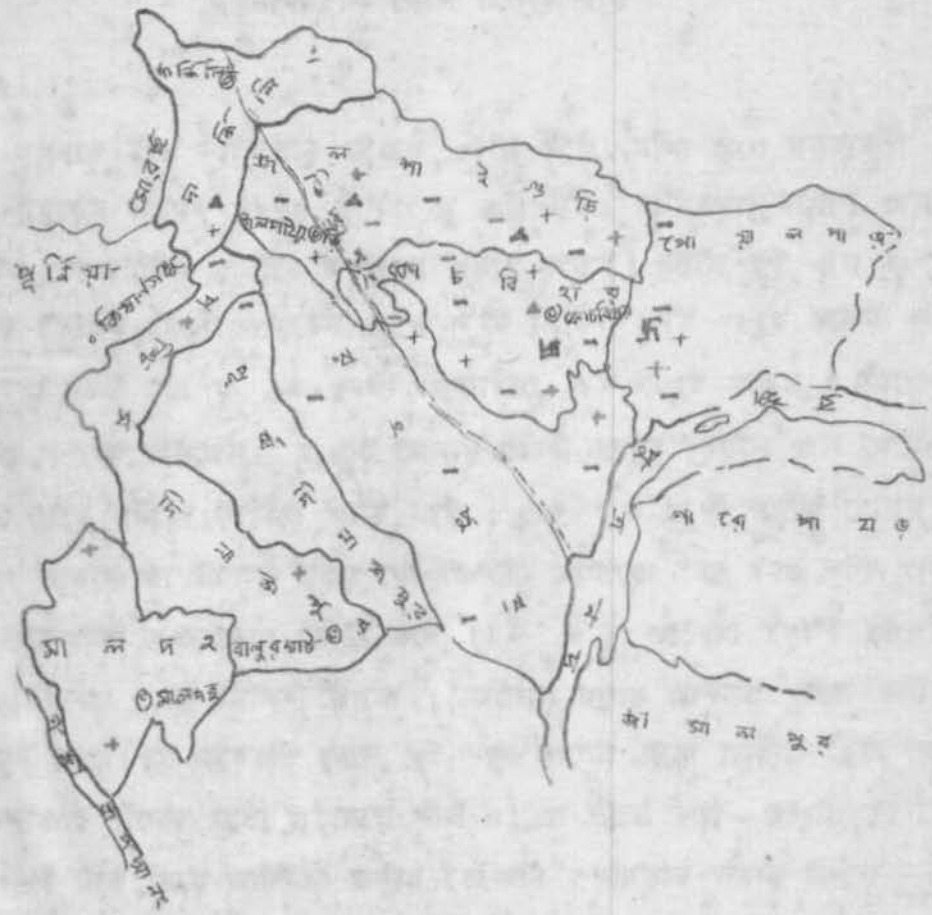

সাংকেতিক চিহ্ন

(লোকসঙ্গীত ও পূজা পার্বণের প্রধান অঞ্চলসমূহের)

ভাওয়াইয়া, চটকা ... –

তুক্ক্যা ... –

চোর চুরনী ... ▲

সোনারায় --- +

কাতি পূজা --- 卐

গ্রাম পূজা - - - +

বড় দেবী পূজা - - - ▲